দ্বিতীয় অধ্যায়
মুকুন্দ চক্রবর্তী ও রামানন্দ যতি : কবি কথা

মুকুন্দ চক্রবর্তী : কবি কথা ও কাব্য রচনাকাল

বাঙালিরা যে চিরকাল ইতিহাস সচেতন জাতি প্রাচীন ও মধ্যযুগের কাব্যগুলি পাঠ করলেই সেকথা জানতে পারা যায়। সমকালে লেখা কবিদের আত্মকাহিনিতে তারই নিদর্শন মেলে। এইসব আত্মকাহিনিগুলির মধ্যে সবচেয়ে পরিপূর্ণ ও সুন্দর যার রচনা তিনি হলেন কবিকঙ্কণ মুকুন্দ চক্রবর্তী যাঁর আত্মকাহিনির প্রারম্ভিক চরণ হল—

''শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ
এই গীত হইল জেমতে
উরিয়া মায়ের বেশে আসিয়া শিয়র দেশে
চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে।''[১]

এই আত্মকাহিনির ঐতিহাসিক মূল্য সর্বাধিক। কারণ এই অংশে কবির বংশ পরিচয়ের সঙ্গে রয়েছে সমকালীর রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের এক বাস্তব চিত্র। মুকুন্দ চক্রবর্তী তাঁর কাব্যে আত্মপরিচয় অংশটিকে দুটি পর্বে বিবৃত করেছেন। প্রথমটি তাঁর বংশপরিচয় এবং দ্বিতীয়টি গ্রন্থ রচনার কারণ। কবিকঙ্কণ অবশ্য দুটি আত্মকাহিনি লিখেছিলেন। প্রথম আত্মকাহিনিটি কবিকঙ্কণের গ্রাম দামুন্যা বা দামিন্যায় রক্ষিত পুথিতে রয়েছে। যে পুথি অবলম্বনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় 'কবিকঙ্কণ-চণ্ডী'র একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন এবং সেটি কাইতি গ্রামের এক পুথিতে পাওয়া গিয়েছিল। দ্বিতীয় আত্মকাহিনিটি অধিকাংশ পুথিতেই পাওয়া যায়। বর্ধমান সাহিত্যসভার ৩২ নং পুথিতে একসঙ্গে দুটি আত্মকাহিনিই আছে।

কবিকঙ্কণ কয়ড়ি কুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কাব্য মধ্যে কবি প্রদত্ত বংশতালিকায় রয়েছে—রাঢ়ীয় কয়ড়ি গাঁই -এর ছোট তরফের সাবর্ণগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন তপন ওঝা। তাঁর পুত্র উমাপতি এবং উমাপতির পুত্র ছিলেন মাধব। মাধবের কনিষ্ঠ পুত্র হলেন মহামিশ্র জগন্নাথ। তিনি 'দশাক্ষর' গোপালমন্ত্র জপ করতেন ও নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর পুত্র হলেন গুণিরাজ মিশ্র বা হৃদয় মিশ্র। হৃদয় মিশ্রের দুটি সন্তান—কবিচন্দ্র ও মুকুন্দ। মুকুন্দের

দুই পুত্র ও দুই কন্যা, যথা—শিবরাম ও মহেশ এবং যশোদা ও চিত্রলেখা। সুকুমার সেনের মতে কবি নিজেকে 'দৈবকীনন্দন' বলেছেন। সেই মতানুযায়ী কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র, মাতার নাম দৈবকী—

''মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয়মিশ্রের তাত
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন
তাহার অনুজ ভাই চণ্ডিকা-আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ।।।''[২]

নটবর চক্রবর্তী প্রকাশিত ১৩৩২ বঙ্গাব্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের তৃতীয় সংস্করণে লিখেছেন—''কবিকঙ্কণের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম কবিচন্দ্র, পিতার নাম হৃদয়, পিতামহ জগন্নাথ, মাতার নাম দৈবকী, পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা, কন্যার নাম যশোদা, জামাতার নাম মহেশ ছিল।''[৩]

আত্মকাহিনি থেকে কবির যে বংশতালিকা পাওয়া যায়, তা কিছুটা নিম্নরূপ—

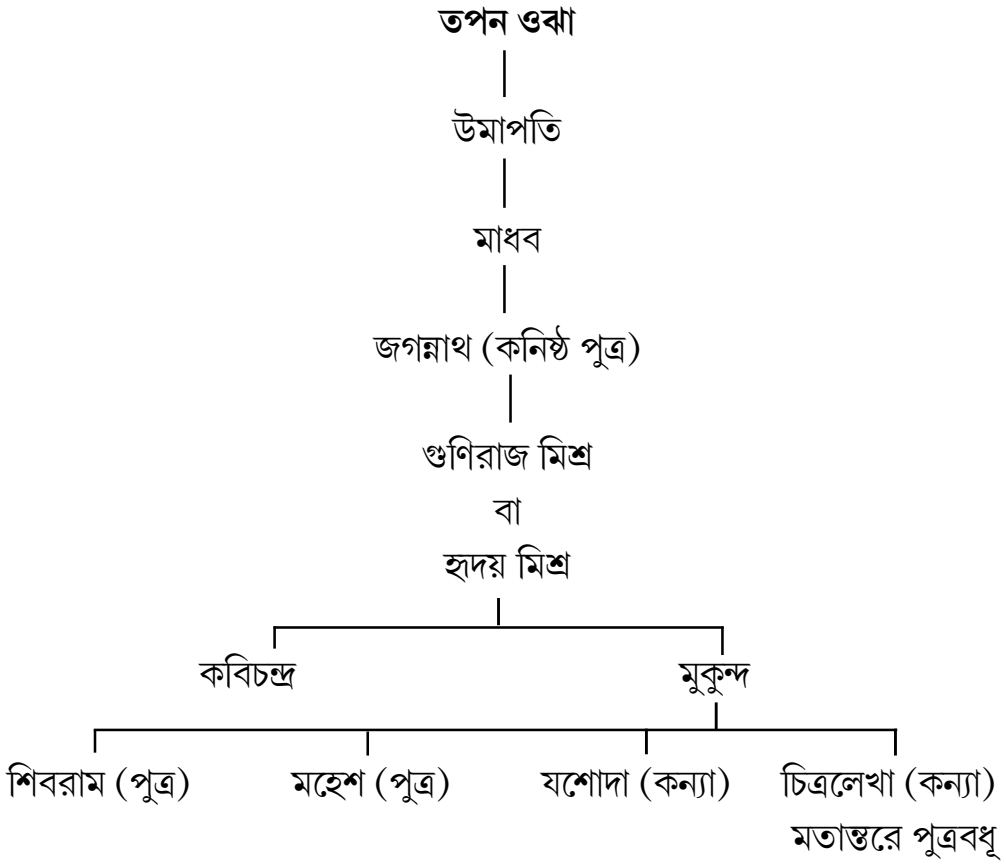

তাঁর একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতাও ছিল, নাম রমানন্দ বা রামানন্দ।

মাধব ওঝা কর্ণপুরের নিবাসী ছিলেন। ইনি কোন এক রাজসভার ধর্মাধিকরণক ছিলেন। বীরদিগর দত্ত তাঁকে নিজেদের পুরোহিত নিযুক্ত করেন এবং দামিন্যায় নিয়ে এসে দেবসেবার দায়িত্ব দেন। তাঁদের সেবিত গ্রামদেবতা হলেন শিব এবং রামচক্রাদিত্য।

কবি বাল্যকাল থেকেই কুলদেবতা বা গৃহদেবতার নিত্য পূজা করতেন—

''গুণরাজমিশ্র-সুত সঙ্গীতকলায় রত
বিচারিয়া অনেক পুরাণ
দামিন্যা নগরবাসী সঙ্গীতের অভিলাষী
শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান।।''[৪]

এছাড়াও শিশুকাল থেকেই ' লৌকিক ভাষায়' তাঁর নতুন কাব্য রচনার ইচ্ছা ছিল—

''তপস্বী হইয়া করি শিবপদ আশা।
মুকুন্দ রচিল গীত লৌকিকের ভাষা।।''[৫]

এই আত্মকাহিনি থেকে আরও জানা যায় যে, মুকুন্দ নিতান্ত অল্প বয়সেই দামিন্যার ''চক্রাদিত্য'' শিবের ''সঙ্গীত'' রচনা করেছিলেন।

দ্বিতীয় পর্বে 'গ্রন্থ রচনার কারণ' অংশটিতে কবি তাঁর আত্মকাহিনিতে বলেছেন— একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত ছয়-সাত পুরুষ ধরে দামিন্যায় তাঁরা বেশ সুখেই বসবাস করছিলেন। কিন্তু হঠাৎ প্রজার পাপের ফলে অধর্মী রাজার রাজত্বে মামুদ শরীফ ডিহিদার নিযুক্ত হলেন। রায়জাদা উজির হয়ে ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের উপর বিশেষভাবে অত্যাচার শুরু করেছিলেন। চারিদিকের অরাজকতায় মানুষ দিশাহারা হয়ে পড়েছিল। স্থানীয় শাসক রাজা গোপীনাথ নন্দী (যিনি মুকুন্দের শুভানুধ্যায়ী ছিলেন) রাজবন্দী হলেন। ফলে দামিন্যায় নিরাপত্তার অভাব বোধ করে কবি গ্রামপ্রধান শ্রীমন্ত খাঁ -এর সঙ্গে পরামর্শ করে দামিন্যা ত্যাগ করার পরিকল্পনা করলেন। ভ্রাতৃস্থানীয় রামানন্দী বা রামানন্দের সঙ্গে শেষ সামান্য সম্বলটুকু নিয়ে সপরিবারে সাত পুরুষের ভিটা ত্যাগ করলেন। পথে ধরা পড়ে যাওয়ার নানান আশঙ্কা। যাত্রা পথে তাঁরা প্রথমে এলেন ভালিয়া বা ভেলো গ্রামে, কিন্তু পথে দস্যু রূপরায় কবির সমস্ত অর্থ কেড়ে নেয়। তবে যাত্রাকালে তিনি বেশ কিছু সৎ ব্যক্তির সঙ্গ লাভ করেন। ভেলো গ্রামে যদু কুণ্ডু (তিলি) তাঁকে তিনদিনের মতো আশ্রয় দিয়ে থাকা ও

আহারের ব্যবস্থা করলেন। তিনদিন পর সপরিবারে গোড়াই বা মুড়াই (মুড়েশ্বরী) নদী পার করে এলেন ভেউটিয়া বা কেউটিয়া গ্রামে। ভেউটিয়া থেকে দারুকেশ্বর নদী পার হয়ে এলেন পাতুলপুরী বা পাতুলী গ্রামে। এখানে গঙ্গাদাস মুকুন্দ চক্রবর্তীর অনেক উপকার করলেন। পরে গঙ্গাদাসের আশ্রয় ত্যাগ করে দামোদর নদী পার হয়ে গোচাড়িয়া গ্রামের ধারে এক পুকুরের পাড়ে তাঁরা আশ্রয় নিলেন। কবির তখন ক্লান্ত ও অবসন্ন শরীর, ক্ষুধায় কাতর ও রাজভয়ে ভীত। ক্ষুধায় কাতর শিশুপুত্রের কান্নায় তিনি একেবারে অসহায়। অগত্যা পুকুরের জল পান করে ক্ষুধা নিবৃত্তির চেষ্টা করলেন আর রুক্ষ মাথায় শরৎকালের এই দিনটিতে পুকুরের শালুক তুলে এবং কুমুদ পুষ্পে দেবতার পূজা করলেন। অবসাদে কবির তন্দ্রা এসে গেলে তিনি সেখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে দেবী চণ্ডী তাঁকে কাব্য রচনার আদেশ দিলেন। স্বপ্নের কথা রামানন্দীকে জানিয়ে আবার তাঁদের পথচলা শুরু হলো। কবির ভাষায় সমগ্র বিষয়টির বর্ণনা কিছুটা এইরূপ—

‘‘দামিন্যা ছাড়িয়া জাই সাঙ্গে রামা নন্দী ভাই
পথে চণ্ডী দিলা দরশনে।
ভেলিঞাতে উপনীত রূপ রায় নিল বিত্ত
যদু কুণ্ড তেলি কৈল রক্ষা
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর
তিন দিবসের দিল ভিক্ষা।
বাহিয়া মুড়াই নদী সদাই স্মঙরিল বিধি
ভেউঠিয়ায় হৈলাঙ উপনীত
দারুকেশ্বর তরি পাইনু মাতুল পুরী
গঙ্গাদাস বহু কৈল হিত।
নারায়ণ পরাশর এড়াইয়া আমোদর
উপনীত কোঁচড়িয়া নগরে
তৈল বিনে করি স্নান কেবল উদক পান
শিশু কান্দে ওদনের তরে।
আশ্রয়ি পূখুর-আড়া নৈবেদ্য শালুক-নাড়া

পূজা কৈল কুমুদ প্রসূনে

ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা গেলে সেই ধামে

চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে।

মাতা করিল পরম দয়া দিলা চরণের ছায়া

আজ্ঞা দিলা রচিতে কবিত্ব

হাথে লইল পত্র মসী আপনি কলমে বসি

নানা ছন্দে লিখিল সঙ্গীত।”[৬]

তাঁরা শিলাই নদী পার হয়ে আড়রা নগরে প্রবেশ করলেন। কবি আড়রার রাজা বাঁকুড়া রায়ের নিকট উপস্থিত হলেন। রাজা কবিকে আশ্রয় দিলেন এবং রাজপরিবারের শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রাজা রঘুনাথ রায় কবিকে গুরুজ্ঞানে সম্মানিত করলেন।

এইভাবে রাজ পরিবারের শিক্ষকতা করে কবির দিন চলে যাচ্ছিল। রামানন্দী তাঁকে দৈবনির্দেশের কথা বার বার স্মরণ করিয়ে দেন। বাঁকুড়া রায়ের পুত্র রঘুনাথের অনুমতি ক্রমে তিনি গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন।

এই আত্মপরিচয় মূলক অংশটি কৌতূহলোদ্দীপক ও সর্বজন-পরিচিত। কবি সমকালীন সময়ের এক ইতিহাসকে কাব্যের এই অংশে উপস্থাপন করেছেন। দেশের শাসনকর্তা বদল হওয়াতে প্রজাদের দুরবস্থা এবং কবি বন্ধু তালুকদার গোপীনাথ নন্দীর রাজরোষে পরে কারারুদ্ধ হওয়া—এসমস্ত ঘটনা বাস্তব ইতিহাসের কবিচিত্রায়িত রূপ মাত্র। আত্মকথা-ঘটিত পদগুলিকে অবলম্বন করে পণ্ডিতেরা মুকুন্দের কালনির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন। তবে পাঠভেদের কারণে তাতে বিতর্কও রয়েছে বিস্তর।

দ্বিতীয় অংশটিকে কবির ‘দামিন্যা-প্রশস্তি’ বলাই শ্রেয়। সেলিমাবাদ নিবাসী গোপীনাথ নন্দী নিয়োগী দামিন্যার তালুকদার ছিলেন এবং মুকুন্দের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাবও ছিল। (সম্ভবত তাঁদের পুরোহিত ছিলেন)। গোপীনাথ নন্দী রাজরোষে বন্দী হওয়ায় মুকুন্দ সপরিবারে অন্যত্র গমনে সঙ্কল্প করেন। দেশ ছেড়ে যাওয়ার সময় পথের অন্ত্যভাগে ক্লান্ত মুকুন্দ স্বপ্নে দেবীর আদেশ পেলেন তিনি যেন দেবী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক একখানি কাব্য রচনা করেন এবং পরে আড়রায় গিয়ে বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয়ে তিনি দেবী মাহাত্ম্যজ্ঞাপক কাব্যখানি রচনা করেছিলেন। স্বপ্নে দেবীর আদেশ পাওয়ার কথা একাধিক পুথির ভণিতায় বার বার পাওয়া যায়। যেমন—

স্বপ্নে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান পরিতুষ্টা জাহারে ভবাণী'', ''সপনে আদেশ পান শ্রীকবিকঙ্কণ গান দামিন্যায় জাহার বসতি'', বনে তেপান্তরের আজ্ঞা কৈল মোরে সঙ্গীত হৈল নির্মাণ'', ''তেপান্তর বিলে মোরে আজ্ঞা কৈলে''।

সুকুমার সেনের মতে— ''গোপীনাথ নন্দীর দুর্গতি এবং মুকুন্দের পিতৃভূমি পরিত্যাগ কোন পুথির কোন ভণিতায়ই সমর্থিত নয় বরং বিপরীত কথা আছে। একাধিক পুথির ভণিতায় ধনপতি কাহিনির গোড়ার দিকে-গোপীনাথ নন্দীর স্বচ্ছন্দে তালুক ভোগের কথা আছে এবং দামিন্যার সহিত কবির যে অবিচ্ছিন্ন যোগ ছিল সে উল্লেখও রয়েছে—

''দামিন্যা-নগরে চক্রাদিত্য সুর
সেবনে জড়িমা করয়ে দূর।
নন্দী গোপীনাথ জাহে ঠাকুর
কৌতুকে রচিল মুকুন্দ পুর।''

বস্তুত মুকুন্দ দামিন্যা থেকে আরড়া গিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু সুখে থাকার জন্য। তিনি যে পিতৃভূমি একেবারে পরিত্যাগ করেছিলেন এমন ধারণাও সঙ্গত নয়। তাঁর পদগুলি পাঠ করলে মনে হয় দামিন্যা ছিল তাঁর নিবাস এবং আরড়া ছিল তাঁর কর্মস্থল।

কাব্য মধ্যে উল্লিখিত আছে দামিন্যা ছেড়ে যাওয়ার সময় কবির সঙ্গে ছিলেন ভাই 'রামানন্দ'। নামটির পাঠান্তরে পাওয়া যায় 'রামা নন্দী', 'রামনাথ' অথবা 'রামনিধি'। আবার মুকুন্দ তাঁর ভাই 'কবিচন্দ্রে'র উল্লেখ করেছেন। কিন্তু 'কবিচন্দ্র' কোন নাম নয় সম্ভবত উপাধি।''[৭] কবি মুকুন্দের নিজের নামও বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। তাঁর প্রকৃত নাম নিয়ে সমস্যা দেখা গেছে। চণ্ডীমঙ্গলের এমন কোন ভণিতা নেই সেখানে কবি তাঁর সম্পূর্ণ নামটি লিখেছেন। কাব্যমধ্যে কোথাও রয়েছে—'কবিকঙ্কণ', কোথাও বা 'শ্রীমুকুন্দ' আবার কোথাও বা 'মুকুন্দ'। আবার অনেকে তাঁকে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি নিজে কোথাও নামের মাঝে 'রাম' যোগ করেছিলেন বলে মনে হয় না কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁর নামের মাঝখানে রাম যোগ হয়ে গেছে। মুকুন্দের সঙ্গে 'রাম' যোগ হওয়ার কথা আমরা প্রথম রামগতি ন্যায়রত্নের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থ থেকে জানতে পারি। কিন্তু কেন 'মুকুন্দরাম' সে বিষয়ে কোন তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

আবার কাব্যের ভণিতায় কবির নামের সঙ্গে 'কবিকঙ্কণ' দেখা যায়। অনেকে মনে

করেন এটি তাঁর উপাধি। কিন্তু উপাধি যদি হতো তবে দাতার নাম অবশ্যই থাকতো সেরূপ কোন উল্লেখ নেই। সুকুমার সেনের মতে—''সেকালে পাঞ্চালিকা-প্রবন্ধের গায়ক পায়ে নূপুরের সঙ্গে হাতে কড়াই ভরা অথবা ঘুঙুর দেওয়া মলের মতো বালা পরিত। চণ্ডীমঙ্গলের মূল গায়েন অদ্যাপি হাতে এমনি 'কঙ্কণ' পরিয়া থাকেন, মন্দিরার মত তাল দিবার জন্য। মুকুন্দ তাঁহার চণ্ডীগানের দলের অধিকারী ছিলেন। তাই এই উপনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।''[৮] কিন্তু সেকালে পণ্ডিত ব্যক্তিদের উপাধি দেওয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। তবে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি মুকুন্দ আদৌ পেয়েছিলেন কিনা সে নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। কবি নিজে কাব্য মধ্যে স্পষ্টভাবে কিছু বলে যাননি। কাব্যের মধ্যে গোপীনাথ নন্দী, বাঁকুড়া রায়, রঘুনাথ রায়ের নাম উল্লেখ আছে। গোপীনাথ নন্দী রাজনৈতিক অস্থিরতায় পূর্বেই বন্দী হন। কবি ব্রাহ্মণভূমি আড়রায় গিয়ে আশ্রয় নেন বাঁকুড়া রায়ের কাছে এবং পরে রঘুনাথ রায়ের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। তিনি রঘুনাথ রায়ের অনুরোধেই কাব্য রচনা শুরু করেন। সম্ভবত তিনিই কবিকে 'কবিকঙ্কণ' উপাধি দিয়েছিলেন তা ধরে নেওয়া যেতে পারে—

''নৃত্যে দিল অনুমতি রঘুনাথ নরপতি
গায়েনেরে দিলেন ভূষণ।''[৯]

সম্ভবত এই ভূষণই হল উপাধি—'কবিকঙ্কণ'।

রচনাকাল :

মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের বিভিন্ন পুথিতে বিভিন্ন সন তারিখ পাওয়া যায়। আবার বিতর্কিত আত্মকাহিনিতে রাজা মানসিংহের প্রশস্তিও রয়েছে। ফলে পুথিতে প্রাপ্ত কাব্য রচনার তারিখগুলির সঙ্গে রাজা মানসিংহের সময়কালের কোনো সঙ্গতি পাওয়া যায় না। সেকারণে চণ্ডীমঙ্গলের আত্মকাহিনির যথার্থতা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। আবার অনেকে কাব্যে উল্লেখিত রচনাকালের গুরুত্ব অপেক্ষা আত্মকাহিনির বক্তব্য বা মানসিংহের সময়কালকেই কাব্য রচনাকাল হিসেবে মেনে নিয়েছেন। ফলে এ বিষয়ে আজও মতান্তরের অন্ত নেই। রচনাকাল বিষয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই বিভিন্ন পুথিতে প্রাপ্ত রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকগুলির উল্লেখ করা যেতে পারে। যে রচনাকালটি প্রথম পাওয়া যায় সেটি হল—

‘শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত মত দিলা গীত হরের বণিতা।।’’

অর্থাৎ ১৪৬৬ শক (১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ) চণ্ডীমঙ্গলের কাব্য রচনাকাল। (প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ ১৮২৩-২৪ খ্রিঃ রামজয় বিদ্যাসাগর সম্পাদিত।) সুকুমার সেন ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দকে মুকুন্দের দামিন্যা ত্যাগ ও কাব্য রচনাকালের সময়কাল বলে মনে করেন। তাঁর সম্পাদিত চণ্ডীমঙ্গল গ্রন্থে তিনি ১৪৭৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দকে কাব্য রচনার শেষ সময় বলে মনে করেছেন—‘‘দ্বিতীয় ভণিতাটি সব পুথিতে এবং ছাপা বইয়ে আছে কাহিনির উপসংহারে অষ্টমঙ্গলায়—

‘‘অষ্টমঙ্গলা সায় শ্রীকবিকঙ্কন গায়
অমর সাগর সুনিবরে
চারি প্রহর রাতি জ্বালিয়া ঘৃতের বাতি
গাইলেন প্রসাদ আদবে।।’’

এখানে প্রথম গাওয়ার তারিখ পাওয়া গেল, অমর (= ১৪) সাগর (= ৭) মুনিবর (= ৭), অর্থাৎ ১৪৭৭ শকাব্দ (= ৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ) পাঠান্তরের বিভ্রান্তি বশে মন্দিরের ধাঁধাঁয় পড়িয়া এই স্পষ্ট তারিখটি এতদিন চোখ এড়াইয়া আসিয়াছে। অতএব দৃঢ়তর বিরুদ্ধ প্রমাণ উপস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত মানিতে হইবে যে মুকুন্দের আড়রা গমনের (দেশত্যাগ বলিব না) কাল ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ, এবং কাব্যরচনা-সমাপ্তিকাল ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দের পরে নয়।’’[১০]

আবার দীনেশচন্দ্র সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ ‘রস’ শব্দের আঙ্কিক অর্থ ‘৬’ (ছয়) না ধরে ৯ (নয়) ধরে ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭ খ্রিস্টাব্দকে কবির দামিন্যা ত্যাগ কিংবা কাব্য রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা বলে মনে করেছেন।

অন্যদিকে হীরাবতীর পুত্র মুকুন্দ মিশ্র ‘বাশুলীমঙ্গল’ কাব্যরচনা করেছিলেন ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে কাব্যের রচনাকালে রয়েছে ‘শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্কগণিতা।’—অর্থাৎ ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ। ফলে মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ প্রসঙ্গে সন্দেহ থেকে যায়। কারণ চণ্ডীমঙ্গলের পয়ারের আঙ্কিক অর্থ একই পাওয়া গেছে।

মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল জ্ঞাপক আরও একটি তারিখ পাওয়া যায়। সেটি হলো—

''সাল শকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বরে।
নির্ঘাত মারিয়া বাণ চন্দ্রের উপরে।।
এই শাকে পুথি হৈল চণ্ডী অনুভব।
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদশা অরংজেব।।''[১১]

অর্থাৎ ১৫০৮ শকাব্দ বা ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দকে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল বলা হয়েছে। এই পয়ারে ঔরংজেবের নাম থাকায় এ তারিখটি নিয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। বিশ্বভারতীর বাংলা পুথিঘরে রক্ষিত ১৬৯ নং পুথিতে একটি অভিনব পুষ্পিকা পেয়েছেন গবেষক বুদ্ধদেব আচার্য মহাশয়। পুথিটির অনুলিপিকাল সন ১২৩৯ সাল ২৭ শে পৌষ মঙ্গলবার। লিপিকর হলেন গঙ্গাসাগর (রায়)। তিনি তাঁর বংশপরিচয় দিয়ে জনৈক ধর্মদাস নামে গায়েন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর প্রসঙ্গে একটি প্রশস্তি লিপিবদ্ধ করেছেন। সেই পুষ্পিকা থেকে আমরা জানতে পারি যে, ধর্মদাস নামে একজন গায়েন কবি মুকুন্দ চক্রবর্তীর পাণ্ডিত্য ও কবি প্রতিভার প্রশস্তি করে একটি পুথির কথা বলেছেন যাতে 'শুন ভাই সভাজন' আত্মকাহিনি দিয়ে শুরু হয়েছিল এবং ঐ পুথিতে দেবখণ্ডে দুটি, আক্ষটি খণ্ডে তিনটি এবং বণিক খণ্ডে এগারটি পালার একটি সম্পূর্ণ পুথি ছিল। ধর্মদাসের মতে মুকুন্দ চক্রবর্তী হেঁয়ালীতে কাব্য রচনার তারিখ দিয়েছিলেন। বিশ্বভারতীর পুথিতে কাব্য রচনাকালের যে উল্লেখ রয়েছে সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যেতে পারে—

১. ''শুন শক বসু পৃষ্ঠে দিয়াছে অম্বরে।
নির্ঘাত মারিয়া বাণ চন্দ্রের উপরে।।''

অর্থাৎ ১৫০৮ শকাব্দ বা ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দ।

২. ''বসু পূর্বে অম্বর চন্দ্রের পরে বাণ'' অর্থাৎ এই ছত্রেও ১৫০৮ শকাব্দ বা ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দকে মুকুন্দের কাব্যের রচনাকাল বলা হয়েছে।

৩. ''সাকে রস রসে সাক সসাঙ্ক যুনিতে।
অম্বিকা মঙ্গলগান গাইল শ্লোকগীতে।।''

—এই ছত্রটিতে সঠিক সময় জানা যায় না।

তবে চণ্ডীমঙ্গলের যে রচনাকালগুলি আমরা পেয়ে থাকি সেগুলি হল—১৫৪৪ খিঃ, ১৫৫৫ খ্রিঃ, ১৫৭৭ খ্রিঃ এবং ১৫৮৬ খ্রিঃ ইত্যাদি।

১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দকে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল বলে গ্রহণ করলে বিষয়টি ঠিক যুক্তিপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠবে না। কারণ বিকর্তন মিশ্র ও হীরাবতীর পুত্র মুকুন্দ মিশ্র ঐ ১৪৬৬ শকাব্দেই বাশুলীমঙ্গল রচনা করেন। দুটি কাজের পয়ারেই ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দ কাব্য রচনাকাল বলা হয়েছে। তবে ১৪৬৬ শকাব্দ কোন কাব্যের রচনাকাল সে বিষয়ে একটি প্রশ্ন রয়েছে। অনেকের মতে ১৪৬৬ শকাব্দ প্রকৃতপক্ষে মুকুন্দ মিশ্রের বাশুলীমঙ্গলেরই রচনাকাল। সেসময় বিকর্তন মিশ্রের পুত্র মুকুন্দ মিশ্র এবং হৃদয় মিশ্রের পুত্র মুকুন্দ চক্রবর্তী গায়েন বা লিপিকরদের কাছে একই ব্যক্তি রূপে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

আবার ১৪৬৬ শকাব্দ বা ১৫৪৪-৪৫ খ্রিস্টাব্দে মুকুন্দের দামিন্যা ত্যাগ এবং কাব্য রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমা ধরলে আত্মকাহিনিটি কিছুটা প্রক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে। কারণ আত্মকাহিনিতে রয়েছে দামিন্যা ত্যাগের সময় তাঁর শিশু পুত্রের ভাত খাওয়ার মতো বয়স ছিল। যদি তিনি শিবরাম হন তবে তাঁর জন্ম ১৫৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়কালকে ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবার ১০৪৭ বঙ্গাব্দ বা ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে বারা খাঁ ও কুতুব খাঁ বিশ বিঘা মৌরসী জমি প্রদান করেছিলেন। হিসেব মতো তখন তার বয়স ছিল ৯০-১০০ বছরের কাছাকাছি। এই বয়সে একজন ব্যক্তির পক্ষে সভাপণ্ডিত ও আচার্যের পদ স্বাভাবিক বিষয় নয়। অতএব, ১৪৬৬ শক বা ১৫৪৪-৪৫ খিস্টাব্দকে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল হিসাবে গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বিষয় নয়। তবে ‘‘শিবরামের ১৬১৯, ১৬৩৫ ও ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দের দানপত্র মিলেছে। তখন পিতা বেঁচে থাকতে পুত্রের নামে দানপত্র লেখা হত না। সুতরাং শিবরামের নামে প্রদত্ত প্রথম দানপত্র (১৬১৯) লেখা হবার আগে মুকুন্দ কাব্যরচনা শেষ করে পরলোকগমন করেছিলেন বলে স্থির করা যায়। এ পর্যন্ত যে আলোচনা করা গেল, তার থেকে একটা বিষয় সুপ্রতিষ্ঠিত যে- মুকুন্দের পূর্বে অভ্যুদয়কাল ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর সন্ধিক্ষণ।’’[১২]

১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দ প্রামান্যতা বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। দীনেশচন্দ্র সেনের মতে ‘শাকে রস রসে বেদ শশাঙ্ক গণিতে’ পয়ারে ‘রস’ শব্দের অর্থ ছয়

-এর পরিবর্তে নয় ধরে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৪৯৯ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দ মনে করেছেন। যদিও 'রস' শব্দের আঙ্কিক অর্থ প্রাচীন পুথিপত্রে ছয় -এর পরিবর্তে নয় ধরা যায় না। সেজন্য ১৪৯৯ শকাব্দ বা ১৫৭৭-৭৮ খ্রিস্টাব্দকে চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকালের ঊর্ধ্বসীমাও বলা যায় না।

এরপর ১৫০৮ শক অর্থাৎ ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দেও বিষয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ড. বুদ্ধদেব আচার্য বিশ্বভারতীর ১৬৯ নং পুথি থেকে রচনাকাল জ্ঞাপক শ্লোকটি উদ্ধার করেছেন। অবশ্য এর আগে (বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির ২১ নং বাংলা পুঁথি, যা ১২১৩) বঙ্গাব্দে লিখিত এই রচনাকাল বাচক শ্লোকটি পাওয়া যায়—

''সাল শাকে বসু পৃষ্ঠে ঠেকিল অম্বর
নির্ঘাত মারিল বাণ চন্দ্রের উপর।।
এই শকে পুথি হইল চণ্ডী অনুভব
ডিল্লীর তক্তেতে তখন বাদশা আওরংজেব।।''[১৩]

এর থেকে ১৫০৮ শকাব্দ (বসু = ৮, অম্বর = ০, বাণ = ৫, চন্দ্র = ১) অর্থাৎ ১৫৮৬-৮৭ খ্রিঃ পাওয়া যায়।

''এটি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত চরণগুলির শেষটিতে দিল্লীর বাদশা অরংজেব অর্থাৎ আওরঙ্গজেবের (রাজত্বকাল ১৬৫৮-১৭০৭ খ্রিঃ) উল্লেখ থাকায় চরণগুলিকে অপ্রামাণিক বলে মনে হয়।''[১৪]

তথ্য-প্রমাণের দিক থেকে সুকুমার সেন তাঁর সম্পাদিত কবিকঙ্কন বিরচিত 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ লিখেছেন এই কাব্যের আত্মকাহিনি অংশটি প্রক্ষিপ্ত। তাঁর মতে—আত্মকাহিনিটির প্রক্ষিপ্ত অংশের রচনাকাল ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি (কারণ তিনি চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল ১৫৪৪-৪৫ থেকে ১৫৫৫-৫৬ খ্রিস্টাব্দ বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন)।

অতএব সুকুমার সেন উদ্ধৃত তথ্য ও পরোক্ষ সমর্থনের সূত্রে আত্মকাহিনিটিতে রাজা মানসিংহ ও অধর্মী রাজার রাজত্বকাল—দুটিকে স্বতন্ত্র সময়ের ঘটনা বলে বিচার করতে পারি, তাহলে মানসিংহের পূর্ববর্তী ইতিহাসে অধর্মী রাজা বা রাজপ্রতিনিধিত্ব রূপে উজির খাঁ রায়জাদাকে ১৫৮৬-৮৭ খ্রিস্টাব্দে আমরা পাই। তাঁর সময়েই দামিন্যায় অত্যাচার হয়েছিল ধরে নেওয়া হলে সময়কাল হবে ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ। কারণ ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্ট মাসে উজির খাঁর

মৃত্যু হয়। সেজন্য মুকুন্দ ১৫৮৬ সালেই দামিন্যা ত্যাগ করেছিলেন বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। এছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের রচনাকালের সর্বনিম্ন সীমা মানসিংহ ও রাজা রঘুনাথের রাজত্বকালের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আত্মকাহিনির দ্বারা সে প্রসঙ্গটিও পাওয়া যায়। তাই মুকুন্দ চক্রবর্তীর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ১৫৮৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু করে ১৬০৪-০৫ খ্রিস্টাব্দ ধরে নেওয়া যেতে পারে।

রামানন্দ যতি : কবিকথা ও কাব্য রচনাকাল

বাংলা মঙ্গলকাব্যের অন্তিম লগ্নে এবং আধুনিক সাহিত্যের ঊষালগ্নে অবস্থান করে যে কয়েকজন প্রচার বিমুখ কবি সেসময় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে আলোড়িত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন রামানন্দ যতি। তবে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের কবিদের ন্যায় পাঠক সমাজের মনে তিনি তেমনভাবে কোন স্থান অধিকার করতে পারেননি। তার প্রধানত দুটি কারণ। প্রথমত, কোন রাজচ্ছত্র ছায়ায় তিনি তাঁর কাব্য রচনা করেননি। দ্বিতীয়ত, তিনি সর্বপ্রকার স্থূলরুচিকে বর্জন করেছিলেন। আদিরস তাঁর কাব্যে নেই, ফলে এই কাব্য সাধারণ পাঠকের মন জয় করতে পারেনি।

'রামানন্দ যতি' নামটিতে 'যতি' অংশটি সন্ন্যাসীসূচক। রামানন্দ নামটি তাঁর নিজস্ব নাম না হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। 'খ' পুথিখানিতে অর্থাৎ এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রাপ্ত পুথিতে কবির নাম লেখা ছিল 'রামানন্দ গোস্বামী'। এর নীচে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের শীলমোহর। শীলমোহরের উপরে প্রথমে পারসিক ভাষার হরফে লেখা 'কিতাব কালিজ ফোর্ট উইলিয়াম।' এসব দেখে মনে হতেই পারে যে সন্ন্যাসী হওয়ার সময় তিনি আনন্দান্ত নাম গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রিয় দেবতা রামকে নামাগ্রে ধারণ করে হয়তো সন্ন্যাস জীবনে প্রবেশ করেছেন। তাঁর রামভক্তির বহু নিদর্শন চণ্ডীমঙ্গলের নানান স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। যেমন—

''শ্রীরামানন্দের বিরচন।
যিনি রাম তিনি চণ্ডী ভেদ নাহি জানে দণ্ডী
সংস্কৃত ভাষাও তেমন।।''[১৫]

ভক্ত তুলসীদাসের শ্রীরামদর্শনের অপূর্ব কাহিনি তিনি দাতারাম ঠাকুরের মুখে পরিবেশন

করেছেন, এই বর্ণনাটি পড়লে হৃদয়ে ভক্তিরস দ্রবীভূত হয়—

‘‘দ্বিজ বলে সেতুবন্ধ রামায়ণে পাই।
সেতু ভাঙ্গা কথা কিন্তু বাল্মীকিয়ে নাই।।
শিবস্থাপনেরো কথা নাই রামায়ণে।
আধ্যাত্মের কথা কই শুন এক মনে।।
রামায়ণ শ্রীপতি শুনেছে বার বার।
সংক্ষেপে এখন কিছু শুন সমাচার।।
এত বল্যা তথা হৈতে ডিঙ্গা চালাইল।
শ্রীপতির ভট্টাচার্য কহিতে লাগিল।।
মধ্যে মধ্যে মাকে ছিরত করেন স্মরণ।
যতি বলে খুলনার সতত ক্রন্দন।।

দ্বিজ কন শুন রে নন্দন।
পিতৃসত্য উদ্ধারিতে রঘুনাথ ভাব্যা চিতে
সীতা সঙ্গে চলিলা কানন।।
লক্ষ্মণ গুণের ভাই রাম বিনা গতি নাই
রাম সঙ্গে চলিলা কান্দিয়া।
ঠাকুরাণী সুমিত্রিয়া লক্ষ্মণেরে রামে দিয়া
সীতা মাকে দিলেন সঁপিয়া।।
হাহাকার অযোধ্যায় পুত্র বনে দেয় মায়
কৌশল্যার প্রাণ যেবা করে।
তাহাকে কহিবে কারে কে তাহা বূঝিতে পারে
শুন্যা ছিরু কান্দে উচ্চস্বরে।
মায়েরে পড়িল মনে শিশু আর নাহি শোনে
মুখ দেখ্যা সবে পায় ভয়।
বুঝিয়া শিশুর ব্যাথা সংক্ষেপে কহেন কথা

দাতারাম কাতর হৃদয়।।''[১৬]

রামানন্দের 'রামতত্ত্ব' তথা রামভক্তির বহু নিদর্শন সমগ্র কাব্যে বিস্তৃত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই যে তিনি রামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। যেমন— একটি অপূর্ব ধুয়া—

''ধুয়া ।। আরে শ্রীরামগুণেরে ভুবন ভরিয়া কান্দেরে শ্রীরামগুণেরে
সেতুতে করিলে স্নান ব্রহ্মহত্যা যায়।
পাপ মোচনের আর নাহিক উপায়।।
বিশেষত সন্ন্যাসীর এইমাত্র গতি।
অবশ্য রামের সেতু দেখিবেন যতি।।''[১৭]

কিংবা—

''ধুয়া ।। রামগুণ ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরিব রে ইত্যাদি
চিনিতে না পারিলেন ঠাকুর তুলসী।''[১৮]

রামভক্তি স্বরূপ আরো কিছু চরণ—

''শ্রীরামের আজ্ঞা নাঞি শুনিয়া হনুর ঠাঞি
আসিতে ভরসা নৈল যার।।''[১৯]

কাব্যের বণিকখণ্ডে খুল্লনার অগ্নি পরীক্ষার সঙ্গে কবি রামায়ণে সীতার অগ্নিপরীক্ষার প্রসঙ্গটি উপস্থাপিত করেছেন—

''খুলনা কহেন জোড় করে।
নিবেদিতে পাই ভয় শুনি রামায়ণে কয়
সীতা গেলা অগ্নির ভিতরে।।''[২০]

কবি মনে প্রাণে এতটাই বৈষ্ণব ছিলেন যে—'চণ্ডীমঙ্গল' রচনার অভ্যন্তরে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের হেতু খুল্লনা উদ্ধারকর্তা রূপে চণ্ডীকে স্মরণ না করে বহ্নি রূপী কৃষ্ণকে স্মরণ করেছে—

''খুলনা বলেন প্রভু না কর্য্যো বিচার।।
আজ্ঞা হয় সে পরীক্ষা করি আর বার।
বহ্নি রূপী কৃষ্ণ মোরে করিবেন পার।।

এত বল্যা নয়ন করিছে ছল ছল।

দেখিয়া কাতর হৈলা ব্রাহ্মণ সকল।।''[২১]

রামভক্তির পাশাপাশি চৈতন্যভক্তিরও নিদর্শন কাব্য মধ্যে রয়েছে। তিনি সন্ন্যাস নিয়ে সম্ভবত ভারতবর্ষের নানা স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর দৃষ্ট স্থানের মধ্যে কৃষ্ণকান্তের বিবরণে গয়া, কাশী, প্রয়াগ, দেবীর নানান পীঠস্থান যেমন—কামরূপ এবং উড়িষ্যার এক সুনিপুণ চিত্র দেখতে পাওয়া যায়। উড়িষ্যা বা নীলাচল পুরী রামানন্দের অত্যন্ত প্রিয় স্থান ছিল। উড়িষ্যাতেই তিনি 'আজ্ঞা' পেয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন—

''যতি রামানন্দ কয় চল বন্ধু বল জয়

নীলাচলে দরশনে যাই।।''[২২]

''রামানন্দ করে মনে ভিক্ষা চায় শ্রীচরণে

পড়্যা থাকে নীলাচলপুর।।''[২৩]

তিনি দাতারাম ঠাকুরের মুখে জগন্নাথ দেবের তত্ত্বকথার বর্ণনা করেছেন—

'দাতা রাম ঠাকুর করেন পাঠকতা।

জগন্নাথ দেবের কহেন তত্ত্বকথা।।''[২৪]

এইসব উক্তি থেকে জগন্নাথ ধাম ও উড়িষ্যার প্রতি তার আবেগপূর্ণ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন কর্তৃক জগন্নাথ মন্দির নির্মাণের কাহিনিটিও তিনি কাব্য মধ্যে যথাস্থানে সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। রামানন্দের আর এক প্রিয় দেবতা হলেন নদীমাতা জাহ্নবী। এই জাহ্নবী তীরে তিনি বহুদিন একা একা ঘুরে বেরিয়েছেন। আবার বন্দনাংশে তিনি ভাগীরথীর স্তবও করেছেন—

''অমা কৈ আছে আমার গ মা বিনে কার শরণ লব।

বন্দো ভাগীরথী মাতা ত্রিজগতে সার।''[২৫]

জাহ্নবীর তীরে তিনি দেহত্যাগের বাসনা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও কাব্যের বিভিন্ন স্থানে দামোদরের উল্লেখও রয়েছে—

''দ্বারী হৈয়া দামোদর রৈলেন তথায়।

কত পুণ্য না জানি কর্য়াছে বলি রায়।।

কত তপ্যা পায়্যাছেন অদিতি যে ধন।

বলির দ্বারেতে রণ সেই নারায়ণ।
যেরূপে মায়ের নাম হৈল ভাগীরথী।''[২৬]

কাব্যে উল্লিখিত নদ-নদীর নাম থেকে কিছুটা অনুমান করা যায় যে তিনি প্রধানত রাঢ়বঙ্গের কবি ছিলেন। এছাড়াও কাব্যের নানা স্থানে রাঢ়ের বিভিন্ন স্থাননাম সহ 'রাঢ়' শব্দটিরও উল্লেখ রয়েছে—

১. ''রাঢ় দেশে ঘর বৈদ্য মহীশ্বর
বিক্রমকেশরী রায়।।''[২৭]

২. ''ইছানী নগর নাম রাঢ় দেশে এক গ্রাম
গন্ধ বান্যা আছে লক্ষ্মীপতি।''[২৮]

৩. ''তপ্ত বালুকাতে পদ ঝাঁঝাইয়া যায়।
রাঢ় দেশ পাথর কুরাই কত তায়।।''[২৯]

৪. ''সপ্ত গ্রাম বর্ধমান এত নিকটে স্থান
বীরভূমি রাজসৈ অবদী।।''[৩০]

৫. ''গঙ্গায় পড়িল ডিঙ্গা কাটোয়ার ঘাটে।
দামোদর দাপটেতে দুইদিক ফাটে।।''[৩১]

৬. ''রাঢ়ের রাজা বিক্রম কেশরী।
তাঁর বান্যা আমি তাঁহার তরী।।''[৩২]

রামানন্দ আত্মপরিচয়মূলক কোন পদ কাব্য মধ্যে উপস্থাপিত করেননি। তবে খণ্ড খণ্ড বিভিন্ন পদে তাঁর আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার এক বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিঃসঙ্গ। উল্লিখিত পদগুলি পাঠ করলে সেকথা অনুমান করা যায়—

১. ''সংসার অনল তাপ কত সব আর।
কি বা জানি অপরাধ কর্যাছি তোমার।।
শোক না করিস মা থাকিব তোর কাছে।
আমা হেন কোটি কোটি সুত তোর আছে।।
নিরালম্ব রামানন্দ কাঁদে বার বার।
মা বিনে সুতের দুঃখ কে হরিবে আর।।''[৩৩]

রামানন্দ নিজেকে সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন। আর সন্ন্যাসীদের পূর্বাশ্রমের কথা জানানো নিষেধ বলেই হয়তো কবি নিজের মাতা, পিতা কিংবা জন্মস্থান ইত্যাদির কোন উল্লেখ করেননি।

‘‘বিশেষত সন্ন্যাসীর এই মাত্র গতি।
অবশ্য রামের সেতু দেখিবেন যতি।।’’[৩৪]

কিন্তু বহু শাস্ত্র পারঙ্গম, বিদগ্ধ তীক্ষ্ণোজ্জ্বল বুদ্ধিসম্পন্ন ভক্ত কবি রামানন্দ তাঁর যে পরিচয় নিজের অজ্ঞাতসারেই গ্রন্থের সর্বত্র ছড়িয়ে রেখেছেন তা নিতান্ত অল্প নয়। কাব্যে উল্লিখিত নিমাইচরণ রায় সম্ভবত জনৈক পৃষ্ঠপোষক যিনি রামানন্দের চণ্ডীমঙ্গলের আসর বসিয়েছেন। কাব্যে আছে—

‘‘নিমাইচরণ রায় প্রতি পদে দোষ গায়
পুস্তকের নাম দোষো নাম।’’[৩৫]

রামানন্দ সম্ভবত বাল্যকাল থেকে পিতা-মাতার সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তিনি হয়তো শৈশবে বিমাতার পীড়ন ও পিতার অবহেলার পাত্র ছিলেন—

‘‘রামানন্দে এই ভয় মা পাছে পসর্যা রয়
বহুকাল দিল ভাসাইয়া।’’[৩৬]

আত্মীয়হীন নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনা তাঁর মনের গভীরে ছিল। তবে সাধারণের মতো তিনি এ জীবন নিয়ে হা হুতাশ করেননি। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি এক বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করেছিলেন। শুধুমাত্র পিতা-মাতার স্নেহহীন জীবনকে তিনি কখনো ভুলতে পারেননি। তাই হয়তো কালকেতু উপাখ্যানে বার বার কবির কথায় উঠে এসেছে পিতা-মাতা ঔদাসীন্যের প্রসঙ্গগুলি—

‘‘খেদাইয়া দিল মায় পিতা না শুধাল তায়
এই লাজে নাহি দেয় দেখা।’’[৩৭]

কিংবা, ফুল্লরাকে দেবীর ছলনায় ব্যক্ত হয়েছে কবিরই ব্যক্তিজীবনের যন্ত্রণার কথা—

‘‘সাগরে ডুবিল ভাই দাঁড়াইতে ঠাঞি নাই
মা বাপের পাষাণ হৃদয়।
শিশুকাল হৈতে যত কঠোর কর্যাছি কত
কব তাহা কিছু মিথ্যা নয়।।

পাগলেতে দিয়া বিয়া মায় দিল খেদাইয়া

স্বামীর নাহিক বাড়ী ঘর।''[৩৮]

এইভাবে 'মা'র ঘর থেকে বের করে দেবার প্রসঙ্গটি বার বার কাব্য মধ্যে উঠে এসেছে। মা'কে একটিবার দেখার জন্য তার হৃদয় ব্যাকুল। তা থেকে অনুমান করা যায় যে তিনি শৈশবে মাতৃহারা হয়েছিলেন—

''পাঁথার দেখিয়া হিরা ফাঁফর হইল ফিরা

জননীকে দেখিবার চায়।

যতি রামানন্দ কয় সাগর ভাবিতে ভাড়

তাহে যায় অতি শিশু তায়।''[৩৯]

'খ' পুথিতে উল্লেখিত রামানন্দের শিষ্য কৃষ্ণকান্তের বিবরণে কবির সন্ন্যাসী জীবনের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। মাত্র সাত বৎসর বয়সে বৈশাখের খাঁ খাঁ দুপুরে একটি আম বাগানে বসে বালক রামানন্দ যে গভীর আত্মচিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন। বন্ধুরা এসে আচ্ছন্ন বালককে বাড়িতে নিয়ে গেলেন। এরপর সন্ন্যাসীরা তাকে দীক্ষা দিলেন এবং তিনি বেরিয়ে পড়লেন পর্যটনে। বহু দেশ ঘুরে, বহু বিদ্যা শিখে, বহু শাস্ত্র পড়ে উড়িষ্যায় সন্ন্যাস নিয়ে তিনি ফিরে এলেন গৌড় দেশে। এখানে সমাজের অবস্থা, বিষয়ের ঘুণ সংসারী লোকের ধরন দেখে তিনি মর্মাহত হয়ে লোকহিতে ব্রতী হলেন। লোকহিতের দুটি ধারা। একটি সংস্কৃতে সদ্‌গ্রন্থ রচনা, অপরটি 'ভাষায়' সৎকাব্য লিখে তা গানের মধ্য দিয়ে প্রচার করা। আর সেকারণেই রামানন্দ রচনা করলেন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যখানি।

রচনাকাল :

কাব্য মধ্যে ব্যক্তি পরিচয়ের কোন সুস্পষ্ট উল্লেখ রামানন্দ না করলেও কাব্য রচনাকাল বিষয়ে তিনি এক স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। তা থেকে আমাদের বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম লগ্নের কবি ছিলেন। কবি রামানন্দ তাঁর গ্রন্থ সমাপ্ত করেছেন ১৬৮৮ শকে (১৭৬৬ খৃষ্টাব্দে) ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনার ১৪ বছর পরে—

''গজ বসু ঋতু চন্দ্র শাকে গ্রন্থ হয়।

চণ্ডীর আদেশ পায়্যা রামানন্দ কয়।।''[৪০]

গজ = ৮, বসু = ৮, ঋতু = ৬, চন্দ্র = ১, = ৮৮৬১ অঙ্কস্য বামা গতি। এটি উল্টে দিলে হবে ১৬৮৮ শকাব্দ। সঙ্গে ৭৮ যোগ করলে হবে ১৭৬৬ খ্রিস্টাব্দ।

এই শ্লোকটির পরে 'খ পুথি' সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু 'ক পুথিতে এর পরেও একটি সুদীর্ঘ মাতৃ স্তব রয়েছে। ভক্তির আকুলতা, আধ্যাত্মানুভূতির গভীরতা এবং সুদীর্ঘ মাতৃস্তব-এর কাহিনি রামানন্দকে একজন ভক্ত কবি রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৩।

২. তদেব, : পৃ. ১১।

৩. রায়, বিশ্বনাথ (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল বীক্ষা ও সমীক্ষা, এবং মুশায়েরা, এপ্রিল, ২০১৪, (মুকুন্দ : ব্যক্তিপরিচয় ও কাব্য রচনাকাল - বুদ্ধদেব আচার্য), পৃ. ১৯২।

৪. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ১০।

৫. তদেব, : পৃ. ১৯।

৬. তদেব, : পৃ. ৩-৪।

৭. তদেব, : পৃ. ৩৭।

৮. তদেব, : পৃ. ৪৩।

৯. তদেব, : পৃ. ৪।

১০. তদেব, : পৃ. ৪২-৪৩।

১১. তদেব, : পৃ. ৪২।

১২. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম - ভারতী বুক স্টল, ৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ১০৫।

১৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) : কবিকঙ্কণ মুকুন্দ বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, সাহিত্য

অকাদেমি, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ২০১৩, পৃ. ৪২।

১৪. মুখোপাধ্যায়, সুখময় : মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম - ভারতী বুক স্টল, ৯৩ মহাত্মা গান্ধি রোড, চতুর্থ সংস্করণ, জানুয়ারি, ২০০৭, পৃ. ১০৫।

১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, অনিলবরণ (সম্পাদিত) : রামানন্দ যতি - বিরচিত চণ্ডীমঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৬৯, পৃ. ১৫৪।

১৬. তদেব, : পৃ. ৩১৩।

১৭. তদেব, : পৃ. ৩১৪।

১৮. তদেব, : পৃ. ৩১৯।

১৯. তদেব, : পৃ. ২২৯।

২০. তদেব, : পৃ. ২৪৭।

২১. তদেব, : পৃ. ২৪৬।

২২. তদেব, : পৃ. ৩১০।

২৩. তদেব, : পৃ. ৩১২।

২৪. তদেব, : পৃ. ২৯৮।

২৫. তদেব, : পৃ. ৯২।

২৬. তদেব, : পৃ. ২৯১।

২৭. তদেব, : পৃ. ২১৫।

২৮. তদেব, : পৃ. ২১৩।

২৯. তদেব, : পৃ. ২২৪।

৩০. তদেব, : পৃ. ২৪১।

৩১. তদেব, : পৃ. ২৫৫।

৩২. তদেব, : পৃ. ২৬৫।

৩৩. তদেব, : পৃ. ৯৩।

৩৪. তদেব, : পৃ. ৩১৪।

৩৫. তদেব, : পৃ. ১০১।

৩৬. তদেব, : পৃ. ৯৬।

৩৭. তদেব, : পৃ. ১৫৮।

৩৮. তদেব, : পৃ. ১৬১।

৩৯. তদেব, : পৃ. ৩২১।

৪০. তদেব, : পৃ. ৪০১।